আনন্দবাজার পত্রিকা

মালিকের তনু, শ্রমিকের গতর

কুমার রাণা

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

বাতাস মধুময়, মধুক্ষরা সমুদ্র।— এটুকু যথেষ্ট নয়, তাই ঠিক এর পরেই কামনা: ওষধিসকল মধুময় হোক। উপনিষদের কালে শুনতে পাচ্ছি: সকলে নিরাময় হোক— সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। এর কিছু আগে-পরে আথেন্সের বিদ্যায়তনে গ্রিকদের অভিজ্ঞতার সার নিষ্কাশন করে অ্যারিস্টটল স্বাস্থ্যকে অভিহিত করছেন এক ‘পরম মঙ্গল’ হিসেবে। মানুষ আপন জৈবিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একই সঙ্গে প্রার্থনা করে চলেছে অন্ন ও ওষধির।

দেহের সুস্থতা-সবলতা আজকের দিনেও ততটাই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আবার, সে-দিনও যেমন সব মানুষকে মানুষ মনে করা হত না, আজও তা-ই। তখন ‘সবাই’ বলতে বোঝাত এক গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের, এ দেশে বৈদিক গোষ্ঠী, গ্রিসে নাগরিক। নারদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন সবার জন্য সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে, তিনি কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের মাতার জীবন বাঁচাতে পঞ্চপুত্র-সহ

অনার্য মাতাকে জীবন্ত দগ্ধ করার ব্যাপারে নিষ্প্রতিবাদ। যে অ্যারিস্টটল বলছেন সব মানুষের পূর্ণতম বিকাশের কথা, তাঁর কণ্ঠে দাসদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধতা ধ্বনিত হয়নি। আজও, বিপুল প্রাচুর্য ও ভয়াবহ দারিদ্রের বৈপরীত্যে ক্ষমতাবানদের দেহ হয় তনু, আর দিনমজুরদের শরীর কেবলই গতর।

অথচ সভ্যতার দাবিটা অন্য রকম। "শরীরটা আছে বলেই আমরা আছি, তা হলে কেন বড়লোকের হাঁচি হলেই ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল, লাখ লাখ টাকা খরচ, আর আমরা রোগ-অসুখে মরতে বসলেও চিকিৎসা পাই না?" এই মানুষী উপলব্ধি থেকে প্রশ্ন করেন, বীরভূমের এক খেতমজুর মহিলা— নাম, ধরা যাক, মালতী। কেন এক জনের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই থাকবে না, আর অন্য এক জনের জন্য খোলা থাকবে হোটেল-সদৃশ হাসপাতালের কাচের দরজা, তা তাঁর বোধের অতীত। হয়তো আমাদেরও। কিন্তু আমরা এটাই মেনে নিয়েছি। কারণ, এতেই আমাদের সুবিধা। আর মালতী ও তাঁর মতো— জন্মের আগেই অমৃতের সন্তান পরিচয় মুছে যাওয়া সহস্র জন মেনে নিয়েছেন, নিরুপায় বলে।

নিরুপায় বলেই বেজুত গতরটার চিকিৎসার জন্য নদিয়ার তাহেরপুরে, ঝাড়গ্রামের খড়িকামাথানিতে, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে শত শত লোকের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সে-দিন তাহেরপুরে দেখলাম এক জন ডাক্তারবাবুকে সারা দিনে তিনশোর বেশি রোগী দেখতে হচ্ছে, ফুলিয়াতে সাড়ে চারশো। তার ক'দিন আগে সিউড়ি সদর হাসপাতালেও দেখলাম এক ছবি। পিজি-র মতো হাসপাতালে তো পা রাখার জায়গা থাকে না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলা হল না, এমন ব্যস্ততার মাঝে সমাজচর্চা নিয়ে তাঁর সময় নষ্ট করাটা শুধু অশিষ্টতাই নয়, অপরাধ। ডাক্তারবাবুর রোগী পিছু এক মিনিটের বেশি সময় দেওয়ার উপায় নেই। রোগী দেখতে দেখতে তাঁর জন্য রাখা চা শীতল হয়, তাতে সর পড়ে। মাথা তোলার সময় নেই। কোথাও এক জন, কোথাও আধ জন, মানে সপ্তাহে তিন দিন। রোগীর অপেক্ষা দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত। অনেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নেই, সেগুলো অচল।

দেশে নিয়ম করা হয়েছিল: প্রতি ত্রিশ হাজার জনসংখ্যা পিছু একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে, ডাক্তার থাকবেন, কিছু ওষুধ থাকবে, কর্মীরা থাকবেন। উদ্দেশ্য, প্রাথমিক স্তরে যথাসম্ভব নিরাময়ের ব্যবস্থা, তার বেশি দরকার হলে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে পাঠানো। সে ভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু, কেরলের মতো কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, দেশনেতারা ক্রমে চমকের শরণাপন্ন হতে লাগলেন। স্বাস্থ্যের কর্তব্যদায় অতি দ্রুত ঝেড়ে ফেলা হল, অবশ্যই অঘোষিত ভাবে। কিছু ব্যতিক্রমের বাইরে, সারা দেশেই ঘোষিত সরকারি নীতি অনুযায়ী যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দরকার তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দিয়েই কাজ চলছে। যেমন এ রাজ্যে, যত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দরকার, আছে তার অর্ধেকের কম। ২০১৮'য় প্রকাশিত তথ্য জানাচ্ছে, এ রাজ্যে ১৩ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নেই, ৬৫

শতাংশ চলে এক জন ডাক্তার নিয়ে। ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে যে বিশেষজ্ঞদের থাকা জরুরি, আছেন তার ৯ শতাংশ। একই কথা বলা চলে স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পর্কেও।

এমন ভাঙাচোরা পরিকাঠামো সত্ত্বেও লোকে কেন ‘নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতে’ তুলে না নিয়ে সরকারি কেন্দ্রগুলোতে কাতারে কাতারে ভিড় জমায়? বস্তুত, গ্রামবাসী, স্বাস্থ্যকর্মী, সকলের কাছেই শোনা গেল, ইদানীং ভিড় বাড়ছে। তার একটা বড় কারণ বললেন তাহেরপুরের এক গ্রামবাসী, “আগে ডাক্তার ছিল না। তখন লোকে এখানে-ওখানে যেত, পয়সা খরচ হত। এখন সপ্তাহে এক দিন হলেও ডাক্তারবাবু বসছেন। আর, প্রায় সব ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। পয়সা লাগছে না। লোকে যাবে না কেন?” ফুলিয়াতে এক স্বাস্থ্যকর্মী জানালেন, “আগে লোকে জ্বর-অসুখ হলে হাতুড়ের কাছ থেকে ওষুধ নিত, এখন সর্দি-কাশিতেও লোকে এখানে চলে আসছে। দেখছেন না ভিড়?” মানুষের কি সময়ের দাম নেই? শুধু ফ্রিতে ওষুধ পাওয়া যাবে বলে সারা দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন? “অবশ্যই দাম আছে, ঘরে কাজ, বাইরে কাজ, কাজের অন্ত নেই। কিন্তু, খরচটাও তো কম কথা নয়। হাতুড়ের কাছে গেলে কিছু না হোক একশো-দু’শো বেরিয়ে যাবে, পাশ করা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার হ্যাপা অনেক, খরচও ঢের। তাই লোকে ভাবে, ঠিক আছে, না-হয় একটা দিন নষ্ট হয় হোক, টাকাটা বাঁচবে। আবার বড় হাসপাতালে যেতে হলেও সুবিধা হবে, এখান থেকে লিখে দেবে”, জানালেন নবলা গ্রামের এক গৃহবধূ। আবার এক প্রাথমিক শিক্ষকের মূল্যায়ন, “গ্রামাঞ্চলে এখন নিদারুণ সঙ্কট, লোকের কাজ নেই, হাতে টাকা নেই। যে দিক থেকে সাশ্রয় করা যায় লোকে সেই চেষ্টাই করছে। বাঁচতে হবে তো?”

মানুষ চাইছেন সামান্য কিছু ব্যবস্থা, যাতে বাড়ির অনতিদূরে চিকিৎসার সুযোগ মেলে। সেটা যে অসম্ভব নয়, সরকার চাইলেই যে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে পারেন, তা দেখাই যাচ্ছে। প্রশ্ন, কতটা চাইছে? এখনও বহু জায়গাতেই পরিকাঠামোর জীর্ণ দশা। উত্তর চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়ির কয়েকটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখা গেল, দেওয়ালে শ্যাওলা, মেঝের ফাটল দিয়ে গজিয়ে উঠছে দুব্বোঘাস। ডাক্তার আসেন কালেভদ্রে, স্বাস্থ্যকর্মী কখনও কখনও। অতএব লোকেরাও আসেন না, তাঁদের ভরসা এক দিকে স্থানীয় হাতুড়ে অথবা ভাগ্য, আর অন্য দিকে মহকুমা বা জেলা হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ। সিউড়ি হাসপাতালে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শ’চারেক রোগী দেখা এক ডাক্তার জানালেন, এঁদের চার ভাগের তিন ভাগেরই নীচের স্তরে চিকিৎসা পেয়ে যাওয়ার কথা। নীচের স্তরটা টলমলে হত না, যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজানো হত। সেটা হয়নি। কখনও প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ, কখনও সুপার স্পেশ্যালিটির মতো চমক, আবার কখনও স্বাস্থ্যবিমার মতো হাতুড়ে চিকিৎসা দিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থার রোগ সারানোর চেষ্টা হয়েছে। আবার কখনও ডাক্তারেরা গ্রামে যেতে চান না, স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করতে চান না ইত্যাদি বলে অন্যের ঘাড়ে দায়

চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসল অসুখটা সারানোর চেষ্টাই হয়নি। অথচ, খুব সম্প্রতি এ-রাজ্যে সামান্য এবং বিক্ষিপ্ত যে উন্নতির আঁচটুকু পাওয়া যাচ্ছে, চমকের বাইরে গিয়ে, মানুষকে কৃপাপ্রার্থীর অমর্যাদায় নামিয়ে না এনে তাকে মানুষ মনে করে এগোলে, সেই উন্নতিকে সর্বব্যাপী করে তোলা সম্ভব। এতে 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' কামনা চরিতার্থ হবে না, সকলকে সুখী করা চলে না, কিন্তু সকলের নিরাময়ের নৈতিক দাবিটা বহুলাংশে মেটানো যায়।